সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ—সভ্যতার সহিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক (State and Nationalism—Relation between Nationalism and Civilisation)

জাতীয় জনসমাজ গঠনের পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বজাতীয় জনসমষ্টি (People) বলিতে কি বুঝায় আমাদের তাহা জানিতে হইবে। বার্জেসের মতে, স্বজাতীয় জনসমষ্টি বলিতে বুঝায় একটি জনসমষ্টি যাহাদের একই ভাষা ও সাহিত্য, একটি সাধারণ ঐতিহ্য ও ইতিহাস, সাধারণ আচার-ব্যবহার এবং ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সাধারণ চেতনা আছে এবং যাহারা একটি ভূভাগে বাস করে। কিন্তু স্বজাতীয় মানুষের গঠনে নির্দিষ্ট ভূভাগ অপেক্ষা একই ঐতিহ্য এবং ঐক্যবোধের গুরুত্ব অনেক বেশী।

স্বজাতীয় জনসমষ্টি কাহাকে বলে?

জাতীয় জনসমাজ (Nationality) গঠিত হয় তখনই যখন স্বজাতীয় একদল লোক আরও গভীর ঐক্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের অন্যান্য জনসমাজ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় একদল জনসমষ্টি লইয়া যাহাদের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে এবং যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করে। স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে বংশগত ঐক্য থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু জাতীয় জনসমাজে বংশগত ঐক্য থাকিবে। কারণ, ইংরাজী "Nationality" কথাটি আসিয়াছে "Natio" কথা হইতে। "Natio" কথাটির অর্থ হইল জন্ম। জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক চেতনা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বজাতীয় মানুষের নির্দিষ্ট মাতৃভূমি অথবা রাজনৈতিক চেতনার অভাব থাকিতে পারে; যেমন, কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদী জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না অথবা ইহুদীদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, কিন্তু তাহারা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল,—ইহাই তাহাদিগকে একটি স্বজাতীয় জনসমষ্টিতে পরিণত করিয়াছিল। জাতীয় জনসমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন হয় এবং একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। জাতীয়তাবোধের সহিত যখন একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় তখন জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

Scanned with CamScanner

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির পিছনে দুইটি রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল; একটি হইতেছে রেঁনেসার যুগে সার্বভৌম শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা এবং আর একটি হইতেছে নিজস্ব সরকার গঠন করিবার বৈপ্লবিক অধিকার। রেঁনেসার যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্থানীয় স্বাধীনতা (local independence) বজায় রাখিবার পক্ষে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপরদিকে প্রত্যেকেরই নিজস্ব সরকার গঠন করিবার অধিকার থাকিবে, এই বৈপ্লবিক অধিকার সম্বন্ধেও জনসাধারণ ক্রমশঃ সচেতন হইয়াছিল। এই দুইটি আদর্শের সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়াছে জাতীয়তাবাদের আদর্শ, বার্নসের (Burns) ভাষায় "Out of Renaissance Sovereignty combined with Revolutionary Rights comes Nationalism"।

জাতীয় জনসমাজের উপাদান (Elements of Nationality)

জাতীয় জনসমাজের উপাদানগুলির মধ্যে আমরা দুইটি ভাগ করিতে পারি, যথা—বাহ্যিক ও ভাবগত। প্রথমতঃ, বংশগত ঐক্য (racial unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু বংশগত ঐক্য যে একেবারে অপরিহার্য তাহা নহে। জার্মান এবং ইংরাজ একই টিউটন বংশোদ্ভব, কিন্তু তাহারা দুইটি পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষে পাঞ্জাবী এবং বাংগালী এক বংশোদ্ভব না হইলেও বর্তমানে এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর দুইটি সভ্য জাতি, ইংরাজ এবং ফরাসী, বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে।

বংশের ঐক্য একটি প্রধান উপাদান, কিন্তু অপরিহার্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষাগত ঐক্য (Sameness of language) জাতীয় জনসমাজ গঠনের অপর একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এই উপাদানটিও একেবারে অপরিহার্য নয়। ভারতবর্ষে অনেক ভাষাভাষী আছে কিন্তু, তাহাতে আমাদের জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত হয় নাই। সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা তিন ভাষায় কথা বলে; রাশিয়ায়ও অনেক ভাষা প্রচলিত। কিন্তু এইজন্য ভাষার বৈষম্য কখনই অখণ্ড জাতীয়তাবোধ গঠনের অন্তরায় হয় নাই। তবে ভাষাগত ঐক্য যে জাতীয়তাবোধ গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, এই উপাদান না থাকিলেও অর্থাৎ, ভাষার ঐক্য না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে।

ভাষাগত ঐক্য —ইহাও অপরিহার্য নয়।

তৃতীয়তঃ ধর্মগত ঐক্য (Religious unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রগুলিতে ইহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা ধরা যাইতে পারে। পাকিস্তানে যদিও মুসলমান-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাধিক্য, হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব সেখানে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে অনেক ধর্মের লোক বাস করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদি এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস। কিন্তু, ধর্মের অনৈক্য সেই দেশে জাতীয় জনসমাজ গঠনে অন্তরায় হয় নাই।

ধর্মগত ঐক্য—ইহার গুরুত্বও কমিয়া গিয়াছে

একজাতি, একরাষ্ট্র নীতি (Principle of One Nation, One State)—যখনই কোন জাতীয় জনসমাজ নিজের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয় তখনই ইহা নিজের পৃথক সত্তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে, বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে। গত শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সমানুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা উচিত। ("It is in general a necessary condition of free institutions that the boundaries of governments should coincide in the main with those of nationalities."—Mill).[১] ইহা হইতেছে জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার (Right of self-determination)। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে যখনই কোন জাতীয় ঐক্য প্রবল হয়, তখনই সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত জনগণের নিজস্ব ও পৃথক সরকার দাবী করিবার প্রাথমিক যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। ("Where the sentiment of nationality exists in any form, there is a prima facie case for uniting all the members of the nationality under the same government.)[২] অর্থাৎ, জন স্টুয়ার্ট মিল "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" (one Nation, one State) নীতি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ("Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities.")।[৩] একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (mono-national state) পক্ষে প্রধান যুক্তি

১। Mill—Representative Government, Chapter on 'Nationality'.
২। Ibid.
৩। Ibid.

Scanned with CamScanner

হইতেছে, ইহা একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (poly-national state) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজকে আত্ম-নির্ধারণের অধিকার প্রদান করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। পতনোন্মুখ জাতির পক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নিজের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান চাই। অপর জাতির পদানত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভব নহে। যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট দাবী আছে। কোন জাতির ন্যায়সংগত দাবি যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শান্তি নষ্ট হইতে পারে। উইলসন বলেন, আত্মনির্ধারণ অধিকার শুধু নিছক বাক্যাংশ নহে, ইহা একটি পালনীয় কার্যনীতি যাহা উপেক্ষা করিলে রাজনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদ সৃষ্টি করিবেন। ("Self-determination is not a mere phrase : it is an imperative principle of action which statesmen will henceforth ignore at their peril.")

কিন্তু লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) এবং গাম্‌প্লোউইক্ (Gumplowicz) "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতি সমর্থন করেন না। অ্যাক্টনের মতে, জাতিতত্ত্ব হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গামী পদক্ষেপ ("The theory of Nationality is a retrograde step in history.")। একটি জাতির বিভিন্ন অধিকারের সর্বপ্রধান বিরোধী হইতেছে জাতিতত্ত্ব স্বয়ং। ("The greatest adversary of the rights of nationality is the theory of nationality itself.") গাম্‌প্লোউইক্ (Gumplowicz) বলেন, একটি জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের যে বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা আছে এই মতের কোনও ঐতিহাসিক অথবা সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি নাই। ("There is no historical or sociological justification of the view that mono-national states possess elements of advantage over those composed of a number of nationalities.")

Scanned with CamScanner

প্রথমতঃ, লর্ড অ্যাক্টনের মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলিও উন্নত হয়। এই সংমিশ্রণ হয় রাষ্ট্রের মধ্যেই যাহার ফলে মানবসমাজের একটি অংশের বীর্য, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অপর একটি অংশে সঞ্চারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক। সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি অনেকদিন যাবৎ বসবাস করিয়া একটি ভাবগত ঐক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাহা জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে লোক-বিনিময়ের সাহায্যে আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে লোক বিনিময় হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মানি ও পোলাণ্ডের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। আংশিকভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি কার্যকরী করিলে অনেক রাষ্ট্রেরই বর্তমান কাঠামো ভাংগিয়া যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই নীতি কার্যকরী হইলে ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আটষট্টিটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। বর্তমানের সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড ত্রিধা বিভক্ত হইবে। ভারতবর্ষকেও মোটামুটিভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। নিজেদের মধ্যে কেবল বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই থাকিবে। আত্মনির্ধারণ নীতির দুইটি দিক্ আছে। একদিকে যেমন ইহা কোন জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে, অন্যদিকে ইহা জনসমাজের মধ্যে ভাংগনের সৃষ্টি করিতে পারে। লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, "The right of self-deter-

Scanned with CamScanner

mination is a double-edged sword ; it is and has been in the past a unifying force but it may be, and has recently become, also a disintegrating force". জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ নীতি একদিকে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল ; অপর দিকে এই জাতি অস্ট্রিয়া-হাংগারী, তুরস্ক এবং রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাংগনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে বিভিন্ন জাতি সর্বাংগীণ উন্নতি করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কোন না কোন বৃহৎ শক্তির তাঁবেদার হইয়া পড়ে। পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল মিঃ জিন্না কর্তৃক প্রস্তাবিত দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে। মুসলমান জাতি পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে ; কিন্তু বর্তমানে ইহা আমেরিকার তাঁবেদার হইয়া পড়িয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ-নীতি একবার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে ইহার পরিসমাপ্তি কোনদিনই হইবে না এবং ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে যে কলহের সৃষ্টি হইবে তাহা আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন করিতে পারে। উইল্‌সন্ বলিয়াছিলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিভিন্ন জাতিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই নীতি কার্যকরী হইলে অনেক ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইবে।

সপ্তমতঃ, অনেক জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না তাহা নহে। বস্তুতঃ, এই রাষ্ট্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বেশী উন্নত। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট্‌ব্রিটেন্ প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনির্ধারণ-নীতির প্রয়োগ করা উচিত। যদি অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে, অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই আছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আত্ম নির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা উচিত। সর্বক্ষেত্রে জাতিতত্ত্ব (Theory of Nationality) রাষ্ট্রগঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি নহে।

Scanned with CamScanner

জাতীয় জনসমাজের অধিকার (Rights of a Nationality)—একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকার। প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন্ ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় দেখিতে পাই। তবুও বিভিন্ন জাতির অন্যান্য অধিকার আছে। সেগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :—

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জাতিকেই দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র কখনই এমন আইন প্রয়োগ করিবে না যাহাতে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা মূলতঃ জাতির বাঁচিয়া থাকিবার দাবী (Right to exist)।

(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবী হইল ভাষারক্ষার অধিকার। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার আছে। এই সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার যাহাতে টিঁকিয়া থাকে সেজন্য প্রত্যেক জাতিই চেষ্টা করে। ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা না থাকিলে এবং সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন না হইলে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির কখনই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভাষার উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করা উচিত নহে, অথবা নিজেদের ভাষা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (right to retention of local laws and customs) অধিকার প্রদান করা উচিত। এই সামাজিক প্রথাগুলি জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। লীগ্ অব নেশন্‌স্ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য দেখিতে হইবে স্থানীয় আচার ও প্রথা যেন সমগ্র জাতীয় জীবনের ক্ষতির কারণ না হয়।

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (right to legal and political equality) থাকা উচিত। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকই এই অধিকার দাবী করিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চোখে সকলেই সমান।

জাতীয়তাবাদের মূল্য ও ত্রুটি—জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সভ্যতা (Value and limitations of the ideal of Nationalism—Ideal of Nationalism and Civilisation)

জাতীয়তাবাদ মূলতঃ একটি অনুভূতি যাহা একটি জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই অনুভূতিকে আমরা ভাবগত ঐক্য বলিতে পারি।

Scanned with CamScanner

শুধু কুলগত, ভাষাগত অথবা ধর্মগত ঐক্য থাকিলেই যে এই অনুভূতি আসে, তাহা নহে। এই অনুভূতি মূলতঃ একটি মানসিক স্বাজাত্যবোধ হইতে আসে। জাতীয়তাবাদের দুইটি দিক্ আছে। প্রথমটি হইতেছে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ (True Nationalism), যাহা একটি জাতিকে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতে অথবা অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রণোদিত করে না। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ পরস্পরের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করে না; বরং ইহা পরস্পরকে আরও কাছে টানিয়া আনে। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে এবং বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। আদর্শ জাতীয়তাবাদের মূলনীতি হইতেছে—'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও।' নিজে বাঁচিবার জন্যই তখন যে কোন রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্কের সৃষ্টি করিতে হয়। কারণ, বর্তমান জগতে কোন জাতি অথবা কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য জাতি অথবা অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব রাষ্ট্রকেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন বর্তমান জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছে যে কোন একটি রাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে। ("The world has become so interdependent that an unfettered will of a state may be fatal to the peace of others"—Laski)[১]। যে জাতীয়তাবোধ কোন রাষ্ট্রকে পররাজ্য আক্রমণ করিতে দেয় না এবং সব জাতির সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে অনুপ্রাণিত করে, সেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবোধের প্রকৃত মূল্য এইখানে। কারণ, প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইলে সব রাষ্ট্রেরই কল্যাণ হয়। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ যেখানে বজায় থাকে, সেখানে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে বার্নস্ (Burns) বলেন,[২] "The value of Nationalism, so far as it implies a relation of one nation to the other, is but a fuller development of the same value as that which each finds in independence. For if each nation is to develop its own characteristics, then each nation is valuable to every other not as a rival of exactly the same kind but

১। Laski—Introductions to Politics—Chapter-4.

২। Burns—Political Ideals, Chapter on Nationalism p. 164

Scanned with CamScanner

as a contrast; and humanity at large is benefited by the preservation of so many distinct types".

কিন্তু জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় দিকটি বিবেচনা করিলে আমরা এই আদর্শের একটি ত্রুটিও দেখিতে পাই। অনেকক্ষেত্রেই আমরা জাতীয়তা-বোধের বিকৃত (Perverted) বিকাশ দেখিতে পাই। সেক্ষেত্রে শক্তিমদে মত্ত জাতিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, যখন কোনও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়।[১] ("As power extends, nationalism becomes transformed into imperialism".) বিকৃত জাতীয়তাবাদ হইতে যে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়, তাহা সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ একটি রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্র আক্রমণ করিবার প্ররোচনা দেয়। এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। এই আধিপত্য বিস্তারের প্রথম পর্যায় হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার। তারপর, ক্রমশঃ "বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে।" অর্থনৈতিক অধিকার স্থাপনের পর শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার হয়; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের শিল্পজাত সামগ্রীগুলির বিক্রয়করণের জন্য অথবা শিল্পোন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলিই পরে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক সময় এই শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বেরও অবতারণা করে,—যেমন, দুর্বল জাতিগুলির উচিত উন্নত জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের উন্নত করা, ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্য দিয়াও বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই প্রকার বিকৃত জাতীয়তা-বোধ এবং সাম্রাজ্যবাদ কখনই আন্তর্জাতিক অনুশাসনের সহিত সুসমঞ্জস নহে। আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) এবং সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) মধ্যে সর্বদাই সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। সাম্রাজ্য-বিস্তার করিতে গেলে একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করিতেই হইবে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রকেও সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখিতে হইবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যাইতেছে, আদর্শ

১। Laski—Grammar of Politics—Chapter-6.

Scanned with CamScanner

হিসাবে জাতীয়তাবাদের ইহা একটি ত্রুটি। যদি "একজাতি এক রাষ্ট্র" নীতি অনুসৃত হয়, তবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-states) মধ্যে গোলমালের এবং কলহের আশংকা থাকে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতক্ষণ গ্রাম্যকলহ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী এবং দলগত হিংসা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের প্রকৃত বিকাশ হয় না, সভ্যতারও অগ্রগতি হয় না। অপর দিকে একই রাষ্ট্রে যদি বিভিন্ন জাতি থাকে তবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র থাকে। কিন্তু ইহার আর একটি দিক্ আছে। যদি একটি জাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই জাতি যদি প্রকৃত জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে যদি বহুজাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও অসহযোগিতা লাগিয়াই থাকে তবে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বশান্তির উপর ইহার খারাপ প্রভাব হইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক জাতির বাস। শক, হুনদল, পাঠান-মোগল এখানে এক দেশে লীন হইয়াছে। কিন্তু, বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি থাকায় ভারতবর্ষ প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিয়াছে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে।

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) :

আন্তর্জাতিকতা শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতি নহে। ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক্ আছে যাহার প্রেরণায় মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বে (universal brotherhood) এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় যদি জাতীয়জীবন হইতেও পরবিদ্বেষ এবং পররাষ্ট্রের উপর লিপ্সা দূর করা যায় তবে আর কখনই আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ এবং কলহের সম্ভাবনা থাকে না। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সংস্কৃতিগত সহযোগিতা, ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত না হয়, তবে ইহা আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। এই দুইটি আদর্শ ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি রাষ্ট্রের সদস্য হইয়া যেমন জনসাধারণ তাহাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের চরম উৎকর্ষতা অর্জন করিতে পারে, সেই প্রকার একটি আন্তর্জাতিক পরিবারের (Family of nations) সদস্য হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র

Scanned with CamScanner

ইহাদের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই,—তাহা হইতেছে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র (Nation States)। সুতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি। আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় জনসমাজ অথবা একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে বিভিন্ন এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতি-জ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিয়া আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহ্যিক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা আন্তর্জাতি-কতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়া চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় না, তখনই প্রকৃতভাবে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসিতেছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। পঞ্চশীলের আদর্শ আন্তর্জাতিকতার প্রসারের পক্ষে খুবই সহায়ক।

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং সদিচ্ছা প্রসারের গুরুত্ব খুবই বেশী। অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বর্তমানের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের (cold war) চাপে এবং আণবিক শক্তির বিস্ফোরণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। পঞ্চশীলের উপরেও বিভিন্ন জাতি যেন ক্রমেই আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছে। সেইজন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান খুব বেশী পরিমাণে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জাতিসংঘ (United Nations) :

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সব জাতিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া লীগ্ অব্ নেশন্স্ (League of Nations) প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের গঠনজনিত এবং প্রকৃতিগত কতিপয় ত্রুটি ছিল। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি উন্নত রাষ্ট্র লীগের সদস্য ছিল না। ইটালী এবং আবিসিনিয়ার যুদ্ধে লীগ নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, এবং ইহার ব্যর্থতার জন্য দ্বিতীয়

Scanned with CamScanner

মহাযুদ্ধও ত্বরান্বিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস্ ভাংগিয়া যায় এবং ইহার স্থানে জাতিসংঘ অথবা "United Nations" স্থাপিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্ট্যালিনের সহযোগিতায়। ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন, স্যানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘের সনদ গৃহীত হয়। সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হইল : (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, (২) পররাজ্য আক্রমণ এবং শান্তিভংগের আশংকা দূরীকরণের জন্য সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের মীমাংসা করা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈয়ার করা, (৪) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবীয় আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা, এবং (৫) ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকার করিয়া সকল জাতিকেই পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইতে সাহায্য করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মর্যাদা ও মূল্য সংরক্ষণ এবং জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইবে বলিয়া সনদে লেখা আছে। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা একশত ছাড়াইয়া গিয়াছে।

জাতিসংঘের প্রধান বিভাগগুলি হইতেছে, সাধারণ সভা (General Assembly), নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ (Trusteeship Council) এবং দপ্তরখানা (Secretariat)।

(১) সাধারণ সভায় সকল সদস্যরাষ্ট্রই জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই সনদের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় লইয়া ইহারা আলোচনা করিতে পারে।

(২) নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা হইতেছে এগার জন। তাহার মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্র হইতেছে স্থায়ী সদস্য, যথা,—ইংলণ্ড, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন। তাহা ছাড়া আরও ছয়টি সদস্য-রাষ্ট্র আছে। সেইগুলি প্রতি দুই বৎসর অন্তর সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই পরিষদ সকল সদস্য-রাষ্ট্রকেই সামরিক এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে পারে। এই পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্রের ভিটো-ক্ষমতা (veto power) আছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী বৃহৎ পঞ্চশক্তির যে

Scanned with CamScanner

কোন একটি নিরাপত্তা পরিষদের যে কোন প্রস্তাব ভিটো-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে।

(৩) সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ১৮টি সদস্য রাষ্ট্র লইয়া অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সহযোগিতা-সংক্রান্ত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করে এবং উহা উন্নত করিতে চেষ্টা করে। ইহার তেরটি বিশেষ সংস্থা আছে; তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা (International Labour Organisation), খাদ্য ও কৃষি-সংস্থা (Food and Agricultural Organisation) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা (World Health Organisation) উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিমূলক সংস্থার (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে বিশ্বব্যাংকের (World Bank) ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) অছি-পরিষদের কাজ হইতেছে যে সকল এলাকা জাতিসংঘের অধীনে আসিবে সেগুলির শাসন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য আন্তর্জাতিক অছি গঠন করা। (…"an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder.) ইহার উদ্দেশ্য হইল অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত করিয়া তোলা।

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক কলহের বিচার করে এবং আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করে। এই বিচারালয়ে ১৫ জন বিচারপতি থাকেন।

(৬) সর্বশেষে, জাতিসংঘের একটি দপ্তরখানা আছে। একজন প্রধান সচিবের (Secretary General) অধীনের আটটি বিভাগের সাহায্যে দপ্তরখানার কাজ পরিচালিত হয়।

জাতিসংঘের ভূমিকা—বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু, জাতিসংঘের বিগত তের বৎসরের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াইতে এই সংগঠন অনেকটা সাফল্য অর্জন করিলেও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে খুব সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। কাশ্মীর এবং থালের জল লইয়া ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব সীমান্ত সমস্যা, ইরানের তৈল লইয়া বিরোধ, সুয়েজ খাল লইয়া মিশরের সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরোধ,

Scanned with CamScanner

হাংগেরীতে সোভিয়েট রাশিয়ার আক্রমণ, কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানে জাতিসংঘ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। পৃথিবীর বৃহত্তম লোকবসতিপূর্ণ দেশ চীন সাধারণতন্ত্র সরকার রাশিয়া, ভারত, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াও জাতিসংঘ কর্তৃক এখনও স্বীকৃত হয় নাই। অপরদিকে আমেরিকার তাঁবেদার চিয়াং-শাসিত ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী চীন আমেরিকার তাঁবেদার হইয়াও পঞ্চশক্তির শোভা বর্ধন করিতেছে। যতদিন জাতিসংঘ সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-মূলক না হইবে এবং বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিটো ক্ষমতা তুলিয়া না দিবে, ততদিন পর্যন্ত জাতিসংঘের কাজে সাফল্য অর্জনের কোনও আশা নাই। বর্তমানে জাতিসংঘের মধ্যে দুইটি দল আমরা দেখিতে পাই। একটি হইতেছে ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভাবিত দল,—অপরটি হইতেছে রাশিয়া প্রভাবিত দল। তাহা ছাড়া আর একটি দল আছে, যে দলের সদস্যগণ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে চাহে,—যেমন, ভারত, মিশর, ব্রহ্মদেশ, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি। এই দলীয় রাজনীতির প্রভাবে জাতিসংঘের কাজ কখনই পরিপূর্ণভাবে সফল হয় না। তবে জাতিসমূহের মধ্যে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার প্রসার করিতে জাতিসংঘ অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহার তেরটি বিশেষ সংস্থার (Special Agencies) মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিশেষ প্রশস্ত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র—জাতীয় জনসমাজের নিম্নলিখিত উপাদান থাকে;—বাংলার ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ধর্মগত ঐক্য, এবং ভৌগোলিক ঐক্য, কিন্তু জাতীয় জনসমাজের পক্ষে এইগুলি হইতেছে বাহ্যিক উপাদান; ইহাদের কোনটিই অপরিহার্য নয়। এই উপাদানগুলি না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে যদি জাতীয় জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভাবগত ঐক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া একজাতিতে পরিণত হয়।

আমরা একটি জাতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই,—(১) একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা অথবা ভৌগোলিক ঐক্য, (২) একটি জনসমষ্টি যাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ বংশগত, ধর্মগত, ভাষাগত এবং আচার-ব্যবহার-গত ঐক্য থাকে, (৩) একটি সরকার যাহা স্বাধীন হইতে পারে অথবা নাও হইতে পারে (স্বাধীন না হইলেও এই রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনটি স্বাধীন হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকিবে)। কিন্তু, জাতির সার্বভৌমত্ব থাকে না। যদি কোনও

Scanned with CamScanner

জাতীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereign authority) থাকে, তবে ইহা রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের অধিকারী এক জাতীয় জনসমাজ। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য চারিটি, —যথা, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, একটি জনসমষ্টি, একটি সরকার এবং ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা। প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য একটি জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যই অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু মাত্র রাষ্ট্রেই দেখা যায়।

জাতির আত্মনির্ধারণের নীতি অথবা 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি—প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে। গত শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সমানুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা উচিত। ইহা হইতেছে একটি জাতির আত্ম-নির্ধারণের অধিকার। অর্থাৎ, মিল্ "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" সমর্থন করিয়াছিলেন।

'এক জাতি, এক রাষ্ট্রের' পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of a Mono-National State)—অধ্যাপক মিলের মতে বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখার স্বার্থেই 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি গ্রহণ করা উচিত।

একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (Mono-national State) পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, ইহা একটি জাতির নিজ সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (Poly-national State) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও টিঁকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার মতে অপর জাতির পদানত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট

Scanned with CamScanner

দাবী আছে। কোন জাতির ন্যায়সংগত দাবী যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত নষ্ট হইতে পারে।

'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' গঠনের বিপক্ষে অথবা জাতির আত্মনির্ধারণ নীতির বিপক্ষে যুক্তি—প্রথমতঃ, লর্ড অ্যাক্টনের (Acton) মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলির উন্নত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক। সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র জাতি অনেক-দিন যাবৎ বসবাস করিয়া একটি ভাবগত ঐক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের অধি-কার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাহা জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে।

চতুর্থতঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি কার্যকরী করিলে অনেক রাষ্ট্রেরই বর্তমানে কাঠামো ভাংগিয়া যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই নীতি কার্যকরী হইলে ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আটষট্টিটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে এবং বর্তমানের সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড ত্রিধা বিভক্ত হইবে। ভারতবর্ষকেও মোটামুটিভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে কোন জাতি আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট জাতিগুলি নিজেরা রাষ্ট্র গঠন করিয়া বৃহৎ শক্তির তাঁবেদার হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠতঃ, জাতির আত্মানর্ধারণ নীতি একবার কার্যকরী করিতে আরম্ভ করিলে কোনদিনই ইহার পরিসমাপ্তি হইবে না। ইহাতে ছোট ছোট অসংখ্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সর্বশেষে অনেক জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (Poly-national State) যে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না;

Scanned with CamScanner

তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নত। রাশিয়া, গ্রেটবৃটেন ভারতবর্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে।

তবে পরিশেষে আমাদের মনে রাখা উচিত, কোন কোন ক্ষেত্রে জাতির আত্মনির্ধারণ নীতির প্রয়োগ করা উচিত। যদি অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে, অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই আছে সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা উচিত। সর্বক্ষেত্রে জাতিতত্ত্ব (Theroy of Nationality) রাষ্ট্রগঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি নহে।

জাতীয় জনসমাজের অধিকার (Rights of Nationalities)—একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকার। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন জাতির অন্যান্য অধিকার আছে। সেইগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :—

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জাতিকেই দেওয়া উচিত।

(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবি হইল ভাষারক্ষার অধিকার।

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (Right to retention of local laws and customs) প্রদান করা উচিত।

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (Right to legal and political equality) থাকা উচিত।

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) আন্তর্জাতিকতা ও শুধু মাত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতি নহে। ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক আছে যাহার প্রেরণায় মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বে (Universal brotherhood) এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সংস্কৃতিগত ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা। যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত না হয়, তবে ইহা আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। দুইটি আদর্শই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই,—তাহা হইতেছে

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র (Nation-States)। সুতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি। আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় সমাজ অথবা একটা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পরস্পরের সান্নিধ্য আনিয়া আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহ্যিক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা আন্তর্জাতিকতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়া চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় না, তখনই প্রকৃতভাবে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসিতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না।

Exercises

1. Define People and Nationality. What are the basic elements of Nationality? Is everyone of them absolutely essential? (১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the factors that create a sense of unity in a State. (১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা)

3. What are the factors that tend to create a Nationality? How does a nation come into being in a country of diverse nationalities? (১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা)

4. Distinguish between (a) Nationality, (b) Nation and (c) State.

5. Discuss the value and limitations of the doctrines of Self-determination as a political principle. (১০৬-১০৯ পৃষ্ঠা)

6. "Self-determination is not a mere phrase. It is an imperative principle of action which statesmen will henceforth ignore at their peril."—Examine the statement. (১০৬-১০৯ পৃষ্ঠা)

Scanned with CamScanner

7. Examine the theory of "One Nation, One State". Do you think that the theory of Nationality is a retrograde step in history ?"—(Lord Acton). Examine the statement. (১০৬-১০৯পৃষ্ঠা)

8. What are the rights of Nationalities ? (১১০ পৃষ্ঠা)

9. "Nationalism is a menace to civilisation."—Do you agree with this statement ? Give reasons for your answer. (১১০-১১৩ পৃষ্ঠা)

10. Do you think that Nationalism is incompatible with an international order ? Give reasons for your answer. Write a note on "Internationalism". (১১০-১১৩ পৃষ্ঠা)

11. Give an account of the composition, functions and working of the United Nations. (১১৪-১১৭ পৃষ্ঠা)

Scanned with CamScanner

নাগরিকতা—নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
(Citizenship—Rights and Duties of Citizen)

নাগরিকতার সংজ্ঞা এবং নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য (Definition of citizenship and the distinction between a citizen and an alien) :

নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে, নগরের অধিবাসী। প্রাচীন গ্রীক শহর-রাষ্ট্রের অধিবাধীগণের মধ্যে যাহারা সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিত তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত। কিন্তু, বর্তমানে শহর-রাষ্ট্রের (city-state) অস্তিত্ব নাই বলিয়া 'নাগরিকতা' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমানে কোন নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন লোক যে একটি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সেই রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমুদয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে। কিন্তু, যাহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না, তাহারা নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু, এরিস্টটলের মতে নাগরিককে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। ভ্যাটেলের (Vattel) মতে নাগরিক হইতেছে পৌর সমাজের কতিপয় সদস্য যাহারা এই সমাজের প্রতি কতিপয় কর্তব্য করিতে বাধ্য এবং ইহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া ইহার সকল প্রকার সুবিধার অংশগ্রহণ করিবার অধিকারী। ("Citizens are the members of the civil society bound to this society by certain duties, subjected to its authority and equal participation in its advantages.") আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলার একটি বিখ্যাত মামলায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, "নাগরিকগণ হইতেছে একটি রাজনৈতিক সমাজের সদস্য। তাহারাই রাষ্ট্র গঠন করে, এবং তাহারাই নিজেদের যৌথ ক্ষমতায় একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অথবা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সেই সরকারের অধীন হইয়াছে।" ("Citizens are members of the political community to which they belong.

Scanned with CamScanner